সুকুমার রায়

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সুকুকমার রায় এক বিরল ও বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি, মুদ্রণশিল্প, গবেষনা, রসরচনা, কবিতা, গদ্য, নাটক, সম্পাদনা, সমিতি পরিচালনা, ভ্রভৃতি নানা কাজ তিনি করেছেন। তাঁর চুম্বকতুল্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষনে যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য গুনীজনের স্বীকৃতি পেয়েছেন। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান এক প্রজন্মের তিনিও তাঁকে নিজের যুবক বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন। এত সব কিছু তিনি অর্জন করেছিলেন মাত্র ছত্রিশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে। যে বয়সে প্রতিভাবানেরা নিজেদের আসল কাজ সবেমাত্র শুরু করেন সেই বয়সেই মৃত্যু তাঁর সকল কর্মের সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়েছিল।

যে পরিবারে সুকুমার রায় জন্মেছিলেন তা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির একটি। তার ওপর তাঁর মা ছিলেন সেকালের তেজস্বী সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। এই দুই পরিবারের চরিত্রগুণ তাঁর মধ্যে মিলেছিল। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কোন বিষয়ে যে তাঁর দক্ষতা ছিল না তা বলা শক্ত। মনোগঠনে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বৈজ্ঞানিক। বাড়ির ছাদে বসে দূরবীন দিয়ে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে তিনি ভালোবাসতেন। আবার বাংলা মুদ্রন শিল্পের ইতিহাসেও তিনি চিরস্মরনীয়। ছবি ছাপার বহু কলাকৌশলের প্রথম আবিষ্কর্তা তিনিই। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সংগীতানুরাগী, ভালো বেহালা বাজাতেন, গান করতে পারতেন, লেখার হাতও ছিল চমৎকার। ছবি এঁকে, ছড়া লিখে, সরল ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ লিখে, পৌরানিক কাহিনিকে মহাকাব্যের পাতা থেকে উদ্ধার করে এনে শিশুদের উপযোগী করে পরিবেশন করায় তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সন্দেশ পত্রিকা নিয়ে সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগতেও তিনি সগৌরবে প্রবেশ করেছিলেন। সুকুমার রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান, পিতার গুণাবলীর সুযোগ্য উত্তরসূরী।

সুকুমার লেখাপড়া শেখেন কলকাতার স্কুলে ও কলেজে। ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ডবল অনার্সসহ তিনি বি এসসি পাশ করে বেরোলেন। এতদিন পর্যন্ত লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনও কাজে তিনি সেভাবে হাত দেন নি। এইবার তিনি কিছুদিনের জন্য অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন। এখন থেকে ১৯১১ সালে বিলাত যাওয়া পযন্ত পাঁচ বছর তাঁর কলকাতাতেই কেটেছে। খানিকটা হালকাভাবে তিনি এই সময় কাটিয়েছেন। হালকা অর্থে অবশ্যই নিষ্কর্মার মত নয়। পরবর্তী কর্মজীবনের জন্য ফোটোগ্রাফি ও মুদ্রনশিল্প নিয়ে গভীরতর চর্চা তিনি তো করছিলেনই। তবে তার ফাঁকে অবকাশও ছিল। এই অবকাশ ভরিয়ে তোলবার জন্য তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা করলেন।

তাঁদের নিজস্ব আত্মীয়বন্ধুদের গোষ্ঠীটি ছিল বৃহৎ। এদের নিয়ে তিনি ননসেন্স ক্লাব নামক একটি ক্লাব স্থাপন করলেন। ক্লাবের পত্রিকার নাম হল সাড়ে বত্রিশ ভাজা। সদস্যদের অভিনয় করবার জন্য তিনি দুটি নাটক লিখেছিলেন - ঝালাপালা, ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল। নাটক দুটি যে খুব উচ্চাঙ্গের তা হয়তো নয়, তবে নির্মল হাস্যরসের রচনা হিসাবে উপভোগ্য। এ দুটির হাস্যরস কখনও কথার কায়দা কখনও বা উদ্ভট পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য বা রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকের মত এদের হাস্যরসের প্রকৃতি। যেমন—

(১) কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না। পণ্ডিত। হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, তোদের আর কিছু হবে না।

''ওয়ান্‌স্ আই মেট এ লেম ম্যান ই এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস''। ওয়ান্‌স্ আই মেট এ লেম ম্যান— কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ইন্ এ স্ট্রিট - সে বিস্তর চেষ্টা করিল। নিয়ার মাই হাউস - কিন্তু হাড় বাহির হইল না। এই সোজা কথাটা বুঝতে পাললি না।

—ঝালাপালা

(২) রণস্থল; সুগ্রীব ও বিভীষনের প্রবেশ

নেপথ্যে

জাম্ববান। ওরে তোরা পালিয়ে আয় রাবন আসছে

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যাঁ — কি

গান

যদি রাবনের ঘুঁসি লাগে গায়
ওরে তুই মরে যাবি, ওরে তুই ম-রে-যা-বি
ওরে পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা
তা না হলে মরে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়েছে — একটা খুব জরুরী কাজ বাকি আছে - সেটা চট্ করে সেরে আসছি।

(প্রস্থান)

—লক্ষণের শক্তিশেল

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলাত যাত্রা করলেন। ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করবার জন্যই তাঁর এই যাত্রা। বিলাতে গিয়ে এই দুই বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সেখানকার Penrose annual পত্রিকায় হাফটোন ব্লক বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা গুণীজনের দৃষ্টি

সৃষ্টিসন্ধান

আকর্ষণ করে। তিনি রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্যরূপে গৃহীত হন। পরে তিনি এর ফেলোও হয়েছিলেন।

আরও একটি কাজ তিনি করেছিলেন, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ রচনা। তখনও, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে, রবীন্দ্রনাথের নাম সেদেশে তেমন পরিচিত ছিল না। সুকুমার রায়ের প্রবন্ধটি তাই সেদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ ঘটনার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ সেদেশে গেলেন। এবং সুকুমারের সঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। এ সম্পর্ক আমৃত্যু অটুট ছিল।

ইতিমধ্যে সুকুমার বিদেশে থাকাকালীনই উপেন্দ্রকিশোর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছোটদের জন্য সন্দেশ নামের একটি পত্রিকা চালু করেছেন। ঐ বছরে দেশে ফিরে সুকুমার এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর নানারকম রচনাই এখানে বেরোতে লাগল। তবে প্রথম যুগে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনায় তিনি জড়িত ছিলেন না। সে কাজ করতেন পিতা উপেন্দ্রকিশোর।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান U Roy & Sons গড়পারের বাড়িতে উঠে আসে। কিন্তু ভালো করে ব্যবসা শুরু করবার আগেই অপ্রত্যাশিত আঘাত এল তাঁদের ওপর। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর মারা গেলেন। তাঁর আরব্ধ কর্ম তখন বেশীরভাগই অসমাপ্ত রয়েছে। সন্দেশ পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন। সেই দুর্দিনে সুকুমার রায় সন্দেশের হাল ধরলেন।

এখন থেকে সন্দেশের তিনি সম্পাদক ও প্রধান লেখকও বটে। মনপ্রাণ সমর্পন করে পত্রিকাটিকে তিনি আরও উচ্চাঙ্গের করে তুললেন। এখন থেকে তাঁর শিশু ও কিশোরপাঠ্য যাবতীয় রচনা সন্দেশেই বেরিয়েছে। গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। তাঁর মৃত্যুর পরে। সেই কারনে প্রকাশকাল দেখে তাঁর রচনাকে তালিকাভুক্ত করা যায় না।

পরিবারে এক স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবার পরে সুকুমার নিজের জীবনটা একটু অন্যভাবে সাজিয়ে নিতে চাইলেন। সাধারনত: দেখা যায় যে সংসারে যাঁরা কর্মী পুরুষ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটা একেবারে নিরবচ্ছিন্ন কর্মজালে বাঁধা। যদিও বা সংসারের দাবীকে তাঁরা এক আধটু জায়গা ছাড়েন, কিন্তু অকাজের উড়ো হাওয়াকে কখনোই নয়। ঠিক এই জায়গাটায় সুকুমার গড়পড়তা মানুষের থেকে একেবারে আলাদা হলেন। উনবিংশ শতকের শেষভাবে তাঁর জন্ম। রেনেসাঁস উত্তর বঙ্গদেশের সেটা গৌরবময় যুগ। সে যুগের মনীষীদের মর্মবাণী ছিল ''Serious interest in life''। সুকুমার নিজেও এই জীবননীতিতে বিশ্বাস করতেন। তার উপর তিনি জন্মেছিলেন ব্রাহ্মপরিবারে। ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে ভালোমত যুক্ত ছিলেন। সেকালের সেই ব্রাহ্মসমাজে Seriousness এর চর্চাটা হত অতিরিক্ত পরিমানে। রঙ্গ রসিকতা পছন্দ করতেন না অনেকেই। তা সত্বেও, কিংবা হয়ত সেইজন্যই সুকুমার বুঝেছিলেন যে জীবনে সময়বিশেষে লঘুচপল হবারও দরকার আছে। নইলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই কথা মনে রেখে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই তিনি তাঁদের আগেকার নন্‌সেন্‌স্‌ ক্লাবের মত আর একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ক্লাবের নাম মান্‌ডে ক্লাব বা ভাষান্তরে মণ্ডা ক্লাব। এই ক্লাবের সদস্যদের নাম শুনলে আজ আমরা শিহরিত হই এবং ভাবি কি অপরিমেয় ছিল সুকুমারের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রশান্ত মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস রায়, প্রভাতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। এঁরা সকলেই তখন যুবক, যদিও সকলেই নিজ, নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছেন। এঁদের নিজস্ব কাজকর্ম যে খুবই 'সিরিয়াস' ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু মন্‌ডে ক্লাবে এঁদের যে মূর্তি দেখা যেত তা ভিন্নপ্রকার। এক এক সদস্যের বাড়িতে এক এক দিন অধিবেশন হত। সেখানে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা হত। আবার হাসি ঠাট্টা রসালাপ, খাওয়াদাওয়া এবং মাঝে মধ্যে বেড়াতে যাওয়ারও ঘাটতি ছিল না। একটি নিমন্ত্রনপত্র দেওয়া গেল—

শনিবার ১৭ই সাড়ে পাঁচ বেলা
গড়পারে হৈ হৈ সরবতী মেলা।
অতএব ঘড়ি ধরে সাবকাশ হয়ে।
আসিবেন দয়া করে হাসিমুখ লয়ে।
সরবৎ, সাদালাপ, সঙ্গীত-ভীতি,
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ, জেনে রাখ
—ইতি

এইভাবেই চলছিল তাঁর জীবনযাত্রা (এরই মধ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সুশিক্ষিত ও সুগায়িকা সুপ্রভা দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় পুত্র সত্যজিতের। কিন্তু তাঁদের সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। এরই অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেকালের দুরারোগ্য কালাজ্বর রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে সুকুমার রায়ের সব রচনাই ছড়িয়ে ছিল পত্রিকার পৃষ্ঠায়। একমাত্র আবোল তাবোল বইটির গেটআপ তিনি দেখে গিয়েছিলেন। তাও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে। ক্রমে তাঁর সমগ্র রচনাবলী উদ্ধার হয়েছে এবং সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব রচনাবলীর মধ্যে তাঁর ছোটদের জন্য লেখাগুলিই বেশি এবং মৌলিক গুণসম্পন্ন। সে রচনাও নানা ধরনের। তাঁর ছোট ছোট অসংখ্য প্রবন্ধ আছে। পিতা উপেন্দ্রকিশোরের ধরনে সাধারন জ্ঞানের নানা দিক নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এগুলি সন্দেশে লিখেছিলেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বিস্ময়কর, যেমন — শিকারি গাছ, রেলগাড়ির কথা, আকাশ আলেয়া, ক্লোরোফর্ম, ভূমিকম্প, মেঘবৃষ্টি, চীনের পাঁচিল, শরীরের মালমশলা, সেকালের কীর্তি, আজব জীব ইত্যাদি অসংখ্য। অতি সহজবোধ্য সাধু বা চলিত ভাষায় এগুলি লেখা। যদিও তখনও বাংলায় চলিত ভাষার চর্চা তেমনকরে শুরু হয় নি, তবু মুখের ভাষাকে তিনি হুবহু ফুটিয়েছেন তাঁর কলমে।

গদ্য রচনায় প্রবন্ধ ছাড়া কিছু আছে ছোট ছোট গল্প। শিশু কিশোরদের জগতেরই আলোছায়া নিয়ে সে সব গল্প তৈরি। কিছু আছে বিদেশি পুরানের গল্প যেমন অর্ফিয়ুস বা হারকিউলিসের গল্প ইত্যাদি। ভারতীয় পুরানকাহিনির গল্পগুলি ইতিপূর্বে সন্দেশের পাতায় উপেন্দ্রকিশোরই লিখে গিয়েছিলেন বলে তিনি আর সেদিকে হাত দেন নি। আর আছে হাসির গল্প। এই গল্পগুলিতে যে জন্য সুকুমার রায় চিরস্মরনীয় সেই অদ্ভুত কৌতুকের স্পর্শ আছে। যেমন দ্রিঘাংচু বা হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি। শেষোক্ত বইটি সচিত্র এবং সেখানে রেখায় ও লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে কিছু প্রাণী যারা অবশ্যই কাল্পনিক অথচ একেবারেই যে কাল্পনিক তাও কি বলা যাবে? নাম করলেই যে বোঝা যায় তারা কারা। তাদের নাম হল গোমরাথেরিয়াম, ল্যাংড়াথেরিয়াম, ল্যগব্যাগার্নিস, চিল্লানোসরাস, বেচারাথেরিয়াম ইত্যাদি। দিঘাংচুতেই আছে সেই বিখ্যাত ছড়া যাকে তাঁর পুত্র সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যে খাঁটি নন্‌সেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে মনে করতেন। ছড়াটি এই—

সৃষ্টিসন্ধান

হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
হঁট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারে গামা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

সুকুমার রায়ের সবচেয়ে পরিচিত বইগুলি হল আবোল তাবোল, হয়বরল ও পাগলা দাশু। ইদানিং অ্যানিমেশন ফিল্মের কল্যাণে পাগলা দাশু খুবই বিখ্যাত হয়েছে। তবে এই দাশুর জগতটি অবাস্তব নয়। এ এক খেয়ালি বাল্যকাল যা চিরপুরাতন হয়েও নিত্যনতুন। অন্য বইদুটির জগৎ কিন্তু বাস্তব জগৎ পুরোপুরি নয়। কিংবা বলা ভালো এ জগৎ খানিকটা কার্টুনধর্মী বাস্তব জগৎ। কার্টুনে যেমন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার হাস্যকর অসংগতির দিকটি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয় এখানেও কার্যত : তাই হয়েছে। কিন্তু কার্টুনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শ্লেষ এ জগতে নেই। অহিফেন সেবন করে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যেমন দেখতে পেতেন মানুষেরা নানারকম ফলের মত সংসার বৃক্ষে ঝুলে আছে, কেউ ঝুনো নারকেল, কেউ কচি ডাব, কেউ তেঁতুল, কেউ বা অপক্ক কদলী; সেইরকম, কোন কিছু সেবন না করেই, শুদ্ধ প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের গুণে কবি ট্যাঁশ গরু, রামগরুড় বা হুঁকোমুখে হ্যাংলাদের দেখা পেয়ে যান, এবং উপভোগ করেন তাদের সঙ্গসুখ, এবং সেই উপভোগের অংশীদার হয় আবালবৃদ্ধবনিতা। সুকুমার রায়ের এই বইগুলি তাই শিশুসাহিত্য হয়েও শুধুই শিশুসাহিত্য নয়, সমান ভাবে বয়স্কপাঠ্যও বটে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এডওয়ার্ড লিয়র বা লুইস ক্যারলের সঙ্গে সুকুমার রায়ের প্রতিতুলনা টানা হয়। আপাতসাদৃশ্য কিছু আছেও। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে সুকুমারের রচনা এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বহুমাত্রিক।

সুকুমার রায়ের জগৎ টা তাঁর চেনা দেশকালেরই জগৎ অথচ সেখানে ঘুরে বেড়ায় অদ্ভুত সব বাতিকগ্রস্ত লোক — কেউ ছায়াধরার ব্যবসা করে, কেউ লড়াইখ্যাপা, কেউ বা দিনরাত কাঠ জ্বাল দিয়ে দিয়ে অবশেষে আবিষ্কার করে ''আকাশেতে ঝুল ঝোলে কাঠে তাই গর্ত'', কেউ লোক ডেকে ডেকে তত্বকথা বোঝাতে চায়। কেউ নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে কেবলি জ্ঞানের কথা টোকে। আহ্লাদিরা হেসে খুন হয় শুধু শুধু, আর রামগরুড় ভয়ে বেরোয় না 'দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে হাসিয়ে ফেলে পাছে। 'এ দেশে রাজা মন্ত্রী এবং আইনরক্ষক সিপাই শাস্ত্রীদের অভাব নেই। কিন্তু রাজা সভায় বসে অন্য রাজকার্য না করে বরং কলসিবাদনরত মন্ত্রীকে কোলে নিয়ে হুক্কাহুয়া বলে চেঁচান। অন্য এক রাজা দুপুর রোদে তপ্ত ইটের পাঁজার ওপর বসে বাদামভাজার ঠোঙা হাতে ভেবে আকুল হয় নেড়া কবার বেলতলায় যায়। এ দেশে রাজপথে চৌমাথায় যখন চারদিকে গাড়ি জুড়ি হৈ হট্টগোল এবং জনপ্রবাহ দিগ্বিদিকে ধাবমান, তারই মাঝখানে একদল লোক তবলা বাঁয়া নিয়ে বসে পড়ে এবং গান গায় দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম - দেড়ে দেড়ে দেড়ে। দুটি ছোট উদাহরণ দেওয়া গেল—

১। বাবুরাম সাপুড়ে (আবোল তাবোল)

বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা দুটো সাপ রেখে যা—
যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই নখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস, মারে না কো ঢুঁশ্ ঢাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত,
সেই সাপ জ্যান্ত, গোটা দুই আনত!
তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠাণ্ডা।

২। হ য ব র ল

কথা নেই বার্তা নেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা মস্ত দাড়িওলা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল ''আমার কথা হচ্ছে বুঝি?'' আমি বলতে যাচ্ছিলাম না কিন্তু কিছু না বলতেই তর্‌তর্ করে সে বলে যেতে লাগল 'তা তোমরা যতই তর্ক করো, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে– ছাগলে কি না খায়।'' —এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল— ''হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজি বিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝোলানো সার্টিফিকেটটি দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রী ব্যাকরন সিং বি. এ খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরন, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরিজিতে লেখবার সময় লিখি B A অর্থাৎ ব্যা। কোন কোন জিনিস খাওয়া যায়, আর কোনটা কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল - পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় - এটা অত্যন্ত অন্যায়।.....''

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে যে নবরসের উল্লেখ আছে তার মধ্যে হাস্যরসই সবচেয়ে ভঙ্গুর। এ যেন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার খেলা। একটু এদিক ওদিক হলেই পতন হবে ভালগারিটির পঙ্ককুণ্ডে। সুকুমার রায় সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই তৈরি করেছিলেন কাতুকুতু বুড়োকে যে লোক ধরে ধরে জোর করে হাসায়। সুকুমারের হাসি আলোর মত উজ্জ্বল ও স্বত:স্ফূর্ত এবং সকল রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জ্বালাবিহীন।

সৃষ্টিসন্ধান